বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব মাথায় রেখে যাত্রা শুরু মুজিবনগর সরকারের

মুহাম্মদ শামসুল হক

একটি রাষ্ট্র আজ সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নিল। এই নতুন নগরে সে রাষ্ট্রের নাম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। তার জন্মলগ্নে আকাশে থোকা থোকা মেঘ ছিল। তার জন্মলগ্নে চারটি ছেলে প্রাণ ঢেলে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি গাইল। তার জন্মলগ্নে পবিত্র কোরান থেকে তেলাওয়াত করা হলো। তার জন্মলগ্নে সহস্র কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল 'জয় বাংলা'।" এটি ছিল একাত্তরের ১৮ এপ্রিল ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিবেদনের একটি অনুচ্ছেদ। প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিলো'নতুন রাষ্ট্র নতুন জাতি জন্ম নিল।'

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ও মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এদিন কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এটি মুজিবনগর সরকার নামেই সমধিক পরিচিত। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মেহেরপুর মহকুমার তৎকালীন প্রশাসক, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা তওফিক ইলাহী চৌধুরী। তাঁর নেতৃত্বে এলাকায় অবস্থানরত প্রতিরোধযোদ্ধারা শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রিসভার সদস্যদের গার্ড অব অনার প্রদান করেন পুলিশ কর্মকর্তা মাহবুবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে 'মুক্তিফৌজ' হিসেবে পরিচিত একদল মুক্তিযোদ্ধা। এ সময় শতাধিক ভারতীয় ও বিদেশি সাংবাদিক এবং প্রচার মাধ্যম কর্মী উপস্থিত ছিলেন। এর আগে ১০ এপ্রিল দেশের 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামকরণ করে বঙ্গবন্ধুর অন্যতম সহযোগী আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে চার সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রীসভা ঘোষণা করা হয়। সরকারের রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। উপ-রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ.এইচ.এম কামরুজ্জামানকে মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং কর্নেল (অব.) এম.এ.জি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। সরকারের প্রকৃতি ছিল সংসদীয়।

১০ এপ্রিল তারিখটিও বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ওইদিনই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করা হয় এবং এতে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জারি করা ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণা বার্তাটি অনুমোদন করা হয়। মূলত মুজিবনগর সরকারের ঘোষিত ঘোষণাপত্রটি ছিল নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী সংবিধান। বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পরবর্তী সময়ে ১৯৭২ সালে ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। ওই অধিবেশনে মুজিবনগর সরকারের ঘোষণাপত্রটির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে তা অনুমোদন করা হয় এবং ১৯৭২ সালে ২৩ মে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষণাপত্রটি প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদের ২ নম্বর তপশিলে বলা হয়েছে, '১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হইল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের ঐতিহাসিক ভাষণ ও দলিল, যাহা উক্ত সময়কালের জন্য ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী বলিয়া গণ্য হইবে।' বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে বড়ো ধরনের সংকটকালে একটি মন্ত্রীপরিষদ ও সরকার গঠন এবং শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করা ছিল বিরাট চ্যালেঞ্জের বিষয়। বঙ্গবন্ধুর সহযোগী হিসেবে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতাদের দূরদর্শিতার ফসল ছিল এই মুজিবনগর সরকার। এ সরকারের অধীনেই প্রায় ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার মাধ্যমে মিত্রবাহিনীর সহায়তায় হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করেছিল। এত কম সময়ে একটি সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার মাধ্যমে বিজয় অর্জনের নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

লক্ষ্য করার বিষয়, বাংলাদেশের সরকার পরিচালিত হয়েছিল প্রতিবেশি দেশের মাটিতে বসে। কিন্তু সেই সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্বদেশের মুক্ত অঞ্চলে। কিন্তু শপথ গ্রহণের আগে কৌশলগত কারণে তা গোপন রাখা হয়েছিল। এমনকি দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের কলকাতা প্রেসক্লাব থেকে মুজিবনগর নেওয়ার সময়ও তাঁদের জানানো হয়নি কোথায় কেন নেওয়া হচ্ছে। সেদিন শপথ অনুষ্ঠানের পর বিশ্ববাসী মিডিয়ার মাধ্যমে জেনেছিল শত্রুমুক্ত বাংলাদেশের মাটিতে খোলামেলা পরিবেশে বাংলাদেশ সরকার শপথ নিয়েছে। আগেভাগে এসব তথ্য প্রকাশ পেলে শত্রু বাহিনী সেখানে আক্রমণের সুযোগ নিতে পারতো। তবে শপথ গ্রহণের পরপরই মন্ত্রী পরিষদের সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সবাই কলকাতা ফিরে যান। ইতিহাসের নানা তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে আমরা নিশ্চিত হই যে, পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোগীদের মধ্যকার আলোচনা ভেঙে গেলে ২৫ মার্চ রাতেই ইয়াহিয়া খান তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পাকিস্তান চলে যান। যাওয়ার আগে পাকিস্তানি সৈন্যদের তিনি বাঙালিদের ওপর অপারেশন সার্চলাইট তথা গণহত্যা শুরু করার নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধু সবকিছু জেনে আওয়ামী লীগ নেতাদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। মধ্যরাতে পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তার করতে আসার খবর পেয়ে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরদিন তাঁকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমরা আরও জানতে পারি যে, এর কয়েকদিন আগে বঙ্গবন্ধু দলের হাই কমান্ডের সঙ্গে এক বৈঠকে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে প্রয়োজনে ভারতে গিয়ে সেখানকার সরকারের সহযোগিতা নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ভারতের কোলকাতায় যোগাযোগের সূত্রগুলোও বলে দিয়েছিলেন তিনি। তবে তা অনেক সাধারণ নেতা-কর্মীদের কাছে ছিল অজানা। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক শুনে ২৬ মার্চ থেকে

সারা দেশের আওয়ামী লীগ-যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ দেশপ্রেমিক অন্যান্য দলের নেতা-কর্মী, বাঙালি সেনাসদস্য, ইপিআরসহ সাধারণ ছাত্র-জনতা প্রাথমিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বাঙালি সেনাবাহিনী, ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর অনেক কর্মকর্তা ও সাধারণ সদস্য পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে প্রতিরোধ যুদ্ধে শামিল হন। পাশাপাশি পূর্বের নির্দেশনা অনুযায়ী সিনিয়র নেতৃবৃন্দসহ অনেকে চলে যান পশ্চিমবঙ্গে। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ তাজউদ্দীন আহমেদ, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এ এইচ এম কামরুজ্জামান ও কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতৃবৃন্দসহ অনেকে ৩০ মার্চের মধ্যে কোলকাতা পৌঁছেন। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়াসহ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাঙালিদের অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, আশ্রয় ও অর্থ সহযোগিতার প্রয়োজনের কথা বলেন। সামরিক-বেসামরিক শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপের পর বঙ্গবন্ধুর প্রতিনিধি হিসেবে তাজউদ্দিন আহমদ ২ এপ্রিল দিল্লী গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে সার্বিক পরিস্থিতি বর্ণনা করেন এবং যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য ভারত সরকারের সাহায্য চান। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা ইতিবাচক হলেও সে সময় তাজউদ্দিন আহমদ উপলব্ধি করেন ভারত সরকারের সার্বিক সহযোগিতা পেতে হলে আন্তর্জাতিক মহলে গ্রহণযোগ্য হয় এমন একটি সরকার গঠন এবং একটি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রয়োজন। এ অবস্থায় তিনি একান্ত ঘনিষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ঘোষণাপত্র তৈরি ও সরকার গঠনের উদ্যোগ নেন। আইনের ভাষায় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি ইংরেজিতে তৈরি করেছিলেন তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম। বাংলায় অনুবাদ করা ঘোষণাপত্রটি এরকম-

মুজিবনগর, বাংলাদেশ ১০ই এপ্রিল, ১৯৭১,

যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন, এবং যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহবান করেন,

এবং যেহেতু এই আহূত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়,

এবং যেহেতু পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে,

এবং যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহব্বান জানান, এবং যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নজিরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংঘটন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে,

এবং যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের জন্য একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে,

এবং যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থ, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম,

এবং পারস্পরিক আলোচনা করিয়া এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থ, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং এর দ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং

এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, এবং রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন,

ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন,

একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, কর আরোপণ ও অর্থ ব্যয়ন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, গণপরিষদ আহব্বান ও মুলতবিকরণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন এবং বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য করিতে পারিবেন।

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির উপর এতদ্বারা অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং তিনি উহার প্রয়োগ ও পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, জাতিমন্ডলীর সদস্য হিসেবে আমাদের উপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করার এবং জাতিসংঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিলাম।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী

বাংলাদেশের গণপরিষদের ক্ষমতাবলে ও

তদধীনে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি।'

তাজউদ্দিন আহমদ দিল্লীতে কয়েকদিন অবস্থান করে ঘোষণাপত্র তৈরি ও মন্ত্রীপরিষদ গঠনের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অবহিত করেন। এই ঘোষণাপত্র ও মন্ত্রীপরিষদ গঠনের ফলে ভারতের পক্ষে বিশ্বকে বোঝানো সহজ হলো যে, তারা পাকিস্তানিদের দ্বারা আক্রান্ত এবং স্বাধীনতা ঘোষণাকারী একটি বৈধ সরকারের পক্ষে সমর্থন দিচ্ছে এবং নিজভূমি থেকে বিতারিত জনগণকে আশ্রয় দিচ্ছে। এ ঘোষণাপত্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যেমন -এতে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা। ঘোষণাপত্রটি ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে বলে ঘোষণা করা-যেদিন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। ওই দিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলাম (রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে তাঁর পক্ষে) আইন বলবৎকরণ আদেশ জারি করেন, যার ফলে বাংলাদেশের ওপর অস্থায়ী সরকারের আইনগত কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। ১১ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের একটি দীর্ঘ ভাষণ প্রচার করা হয়। এরপর সরকারের মন্ত্রিসভা, মুক্তিবাহিনী পুনর্গঠন, যুদ্ধ চালনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হয়। সরকারের মন্ত্রণালয়গুলো পরিচালনার জন্য ১২টি বিভাগ ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সারা দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে এসব সেক্টর পরিচালনার জন্য একজন করে সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ দেওয়া হয়। এ ছাড়াও রাজনীতিবিদদের নিয়ে গঠিত হয় ১১টি আঞ্চলিক পরিষদ। সরকার নিয়োজিত একেকজন আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্মকর্তা আঞ্চলিক পরিষদকে সহায়তা করতেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে দেশে পাঠানো হতো। তাঁরা দেশের ভেতর কখনো গেরিলা কায়দায়, কখনো সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়ে পাকিস্তানি শত্রু বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ।

অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার গঠনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় আরও একটা দিক লক্ষণীয় ছিল যে, তখনও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিকল্প বা সমকক্ষ কোনো নেতা আওয়ামী লীগের মধ্যে ছিল না। তাজউদ্দিন আহমদসহ সকল নেতাই তা উপলব্ধি করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়েই সংশ্লিষ্ট সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর নাম সামনে রেখে তাঁকেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে সরকার গঠন করা হয়। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকলেও তাঁর নাম মাথায় রেখেই নয় মাসব্যাপী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে আত্মত্যাগ করে গেছেন লাখো জনতা। অবশেষে এই সরকারের কর্তৃত্বেই পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশ।

লেখকঃ প্রাবন্ধিক, সম্পাদক-দ্বিমাসিক ইতিহাসের খসড়া, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষক (বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত)।

পিআইডি ফিচার